ধর্ষণের শিল্পমানঃ সাবিত্রী উপাখ্যানের পাঠ প্রতিক্রিয়া

উম্মে ফারহানা

হাসান আজিজুল হকের সাবিত্রী উপাখ্যান[১] উপন্যাসটি পড়তে শুরু করার আগেই জানতে পারা যায় যে এটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত, সাবিত্রী নামের নারীচরিত্রটি আসলেই ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন, অন্তর্যামী কিংবা সর্বদ্রষ্টা বর্ণনাকারীর (ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ওমনিশ্যান্ট ন্যারেটর) জবানিতে লিখিত হলেও সাবিত্রী ধর্ষণ মামলার বেশ কিছু সাক্ষ্যের উল্লেখ উপন্যাসে রয়েছে। সেই হিসেবে ধর্ষণ ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অনেকটাই কল্পিত নয় বলে ধরে নেওয়া যায়। তৎকালীন উপনিবেশিক ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আদালত পর্যন্ত গড়ানো ধর্ষণ মামলা কী ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার বর্ণনা বা বিশ্লেষণ উপন্যাসটিকে অন্য অনেক নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসের থেকে আলাদা করেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই লেখার আলোচ্য বিষয় সেটি নয়, বরং ধর্ষণের বর্ণনাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে গিয়ে লেখক গতানুগতিকতার বাইরে বেরোতে পেরেছেন কিনা সেটাই খুঁজে দেখার চেষ্টা এই লেখার উদ্দেশ্য।

করুণরস, সমবেদনা এবং ক্ষমা

'বেদনায় ভরা পেয়ালা'[২] শীর্ষক প্রবন্ধে হাসান ফেরদৌস সাবিত্রী উপাখ্যান সম্পর্কে বলছেন এই উপন্যাস ধর্ষণের বিবরণ নয় এবং সে বিবরণ দেওয়াও লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর মতে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ষণ সংক্রান্ত যে "ভীতি, অনিঃশেষ ক্রন্দন ও পাশবিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে" সাবিত্রী নামের বালিকাকে যেতে হয়েছিল পাঠককে সেই অভিজ্ঞতার শরিক করা। হাসান ফেরদৌস মনে করেন লেখক ভালোবাসার দুহাত দিয়ে আগলে রেখে সাবিত্রীর গল্পটি বলেছেন অত্যন্ত মানবিকভাবে।

উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লেখক সাবিত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। ধর্ষণের শিকার সকল নারীর কাছে পৃথিবীর সকল বিবেকবান পুরুষের পক্ষ থেকে চাওয়া এই ক্ষমা লেখককে মানবিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করায় বলে হাসান ফেরদৌস মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'ধর্ষণের বিবরণ নয়' বলতে হাসান ফেরদৌস সম্ভবত বুঝিয়েছেন যে এই বইয়ে ধর্ষণের এমন কোন 'রগরগে বর্ণনা' নেই যা পড়ার মাধ্যমে পুরুষ পাঠকের সুপ্ত কোন যৌন ফ্যান্টাসি জাগ্রত হতে পারে। আমি এই মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই।

বর্ণনা কিংবা বিবরণ

সাবিত্রীর সঙ্গে ঘটা বলাৎকারের বর্ণনা উপন্যাসে কীভাবে আছে একটু দেখে নেওয়া যাক- ৩১ থেকে ৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সাবিত্রীর উপর জোরজবরদস্তি করে লোকালয়ের বাইরে আনার বিবরণ, ৩৫ পৃষ্ঠার শেষে এসে-

"সে হাত বাড়িয়ে সাবিত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বালির উপর শুয়ে পড়ল। বটা, হাত দুটো চেপে ধর, সবুর, তুই ধর পা দুটো। আগে ধর তো, তারপর দেখছি। ঘাড়ে কাজ এসে পড়ল। ওদের খিদেটিদে মাথায় উঠল। সাবিত্রী এখন শুধুই মাথা নাড়তে পারে, মাথার পেছনটা ঠুকতে পারে বালির উপর আর একটানা না না আমার সব্বোনাশ কোরো না, কোরো না।"

এই প্যারায় যেটুকু বর্ণনা আছে তাতে পাঠক কল্পনায় দেখে নিতে পারেন কী ঘটছিল আর কীভাবে ঘটছিল।

"ভীষণ বিরক্ত দুর্গাদাস বটার দিকে চেয়ে বলল, মুখটা চেপে ধরতে পারছিস না! দুই হাতের উপর বোস, মুখটা চেপে ধর। খুব ধীরে ধীরে কাজ এগোতে লাগল। দূর্গাপদ সাবিত্রীকে ভালো করে শুইয়ে দিচ্ছে। নিজের হাতে সাবিত্রীর পা দুটোকে শান্তভাবে বিছিয়ে দিচ্ছে। তারপর নাভির উপর ধীরে ধীরে চেপে বসছে, সবুর আস্তে আস্তে পা দুটো হাঁটু অব্দি গুটিয়ে দিচ্ছে, শাড়িটা এতক্ষণে বাতাসে উড়ে গিয়ে একটা মাটির ঢিবিতে আটকে রক্ত-পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে"।

এত দীর্ঘ বর্ণনা ধর্ষণের শিকার নারীর পাশবিক যন্ত্রণা বোঝানোর জন্যে জরুরী ছিল ধরে নিয়েও এর ঠিক পরের অংশটুকু পড়ে দেখা যাক-

"দূর্গাপদ সযত্নে শুয়ে পড়ল সাবিত্রীর ওপর। ইস্পাতের একটা বলম স্বচ্ছ আচ্ছাদনটুকু ছিঁড়ে মাখনের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছুল। সাবিত্রী আর একবার মাত্র চিৎকার করে উঠল। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ, সংক্ষিপ্ত মৃত্যু- চিৎকার এই একটাই"।

আমি এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দুটো শব্দের দিকে। এক 'সযত্নে' আর দুই 'মাখনের'। একই প্যারার আগের অংশে রয়েছে 'ধীরে ধীরে' আর 'আস্তে আস্তে'। কাজ এগোতে থাকা বলতে লেখক নিশ্চয়ই ধর্ষণকেই বুঝিয়েছেন। এই কুকর্ম সাবিত্রী নির্যাতনের বর্ণনায় 'কাজ' হয়ে উঠেছে।

এর আগের পৃষ্ঠায় দূর্গাপদের ঝুঁকে পড়াকে প্রণামের ভঙ্গির সঙ্গেও তুলনা করেছেন লেখক। তিন ধর্ষকের মধ্যে কার পালা আগে তা নিয়ে তিনজনের মধ্যকার আলাপ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব বা সমঝোতার উল্লেখও আছে।

সংবাদপত্রে ধর্ষণের খবরে 'রাতভর', 'উপর্যুপরি', 'পালাক্রমে' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে ধর্ষণের রগরগে বর্ণনা দেবার কথা উল্লেখ করে উম্মে রায়হানা তাঁর 'গল্প-কথা-দৃশ্যঃ উপভোগ বনাম হুমকি'[৩] প্রবন্ধে বলছিলেন যে *"ধর্ষণ সম্পর্কে প্রচলিত সব রকমের চর্চা থেকে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, সামাজিকভাবে ধর্ষণের গল্প যতটা মর্মান্তিক, ঠিক ততটাই 'উপভোগ্য'ও বটে"*। তিনি আরো বলেন ভিক্টিমের নাম প্রকাশ না করেও 'ষোড়শী', 'যুবতী', 'তরুণী', 'কিশোরী' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ভিক্টিমকে যৌনবস্তু করে তোলা হয়।

উপন্যাস মানে আখ্যান, তার ভাষা সংবাদপত্রের মতন 'রসকষহীন' হবে না সেটাই স্বাভাবিক। আসুন দেখা যাক জেমকন সাহিত্য পুরষ্কারপ্রাপ্ত এই উপন্যাসে নায়িকার রূপযৌবনের বর্ণনা কতটা রসালোভাবে এসেছে।

জন্মের পরই ধাই সাবিত্রীকে দেখে চাঁদের ফালি বলেছিল, এতে বোঝা যায় সে অত্যন্ত রূপবতী। আট বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, তখনকার পোশাকের উল্লেখ আছে এভাবে-

"ফ্রক আর ছোট্ট পেন্টি পরত তখন সাবি। মন্দ লাগত না দেখতে। ফ্রকটা ঘটিহাতা। হাতা বলতে কিছু নেই, দুই কাঁধে কুঁচকি দেওয়া দুটি ঘটি। বগলকাটা বাউজের মতো। হাঁটুর নিচে পর্যন্ত লম্বা। ওদিকে পেন্টিটা একে কুঁচি দেওয়া, তার ওপর ল্যাভোটের মতো। প্রায় ন্যাংটোই থাকা বলা চলে"।

যে নারী ষোল বছর বয়সে ধর্ষণের শিকার হলেন, আট বছর বয়সেই

লেখকের বয়ানে তাঁকে যৌনবস্তু হতে হলো। দেখতে মন্দ লাগত না এ কথা জানাবার পরে হাতাগুলো যে আসলে ঠিক হাতা নয় আর পেন্টিটাও তার লজ্জা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয় তা বলে দেওয়া হলো।

সাবিত্রীর ঋতুস্রাব শুরু হবার উল্লেখ যেখানে আছে সেখানে লেখক তার স্তনের বর্ণনা দিচ্ছেন- *"মাত্র একটা খোলসের তলায় পুরুষের ভোগ্য, শিশুর খাদ্য। কোমল, সুগন্ধ রেণুমাখা একজোড়া কদম ফুল"*। লেখক নিজে তাঁর পুরুষ পরিচয়ের বাইরে বেরোতে চান না সে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা থেকেই বোঝা গেছে। আর সাবিত্রীর শরীরের বর্ণনা দেবার সময় স্তনকে পুরুষের ভোগ্য হিসেবেই দেখছেন, যদিও তা নিশিবালার দৃষ্টি ধার নিয়ে। নিশিবালার বরাতে আরো জানা যায় সাবিত্রীর স্তনের আকার, *"আঙ্গুল দিয়ে দেখি দিদি, তোমার মাইদুটির মাঝখান দিয়ে একটা সরু আঙ্গুলও ঢোকে কি না"*।

সাবিত্রীকে ধর্ষিত হবার আগে পাঠকের চোখে বড়ই রমণীয় ও কাম্য নারী হিসেবে উপস্থাপন করে তারপর তাঁকে পুরুষের খাদ্য হিসেবে বর্ণনা করেন লেখক।

"দলের সবচেয়ে বড় সিংহটা দাঁত আর থাবা বসিয়ে যখন মাংসের চাঙরটা নিয়ে যায়, তারপর ছিন্নভিন্ন শিকারের বাকিটা কে কার আগে বা পরে কতটা নিতে পারল, তার হিসাব না করলেও চলে"।

এরপরের অনেক বার রয়েছে 'সাবিত্রীর শরীরের অনেকখানিই এখন খেয়ে নেয়া', 'সাবিত্রীর শরীর জুড়ে হাজার লক্ষ বলম তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করছে' ... বিভিন্ন মেটাফোর দিয়ে শিশ্ন প্রয়োগের উল্লেখ, অন্যান্য যৌন নির্যাতনের বর্ণনায়ও ভাষার কারুকাজ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন- *"দুই হাতে দুই বুক ধরে পিষে দিয়েই ছেড়ে দিল আর ভরা কলসির মতো তার পাছায় ধপধপ করে তিনটে চাপড় মারল"*। 'ভরা কলসির মতন পাছা' সাবিত্রীর যৌন আবেদন বোঝাবার জন্য নিশ্চয়ই। এভাবে প্রতি ধাপে সাবিত্রীর উপর অত্যাচারের বর্ণনায় তাঁর অসহায়ত্বের সঙ্গে সমান্তরালে চলতে থাকে এমনি সব বর্ণনা।

৬৮ পৃষ্ঠায় বদ্ধ ঘরে সবুর যখন আবার সাবিত্রীকে ধর্ষণ করে তখন আবার দেখি *"গা থেকে মোটা চাদরটা খুলে ভাজ করে করে একটা বালিশ তৈরি করে মাটিতে রেখে খুব যত্ন করে তাকে শুইয়ে দিচ্ছে সবুর"*। শুধু এই বাক্যটি পড়লে এটিকে একটি প্রেমদৃশ্যের আরম্ভ বলে মনে হতে পারে। আবারও 'যত্ন' শব্দটি এসেছে। ধর্ষক কী করে ধর্ষিতাকে 'খুব যত্ন করে শুইয়ে' দেয় তা বোধগম্য হওয়া খানিক দুঃসাধ্য। এর পরবর্তী পুরো এক পৃষ্ঠায় সাবিত্রীর উপর জোরপূর্বক সবুরের উপগত হবার বিবরণে সাবিত্রীর অনুভূতি যেভাবে আসছে, *"এত অসহ্য এত তীব্র! এত অসহ্য কি যন্ত্রণা নয় কি? এত ভয়ানক কষ্টই বা কি জন্যে- আনন্দই কি সেটা? কোন আনন্দই তো এমন হয়না!"*

সতীত্ব এবং...

সাবিত্রীকে রমণীয় ও কাম্য হিসেবে বর্ণনা করে পরবর্তীতে খাদ্যে পরিণত করার এই প্রক্রিয়াটি প্রচলিত ধারার মধ্যেই পড়ে। সাবিত্রীর প্রতি করুণা ও তাঁর ধর্ষকদের প্রতি ঘৃণা উগড়ে দেওয়ার জন্য তাদের পশু, মোষ, শুয়োর, পাঁঠা এসব মানবেতর বিশ্লেষণে বিশেষায়িত করেও শেষ পর্যন্ত নারীর প্রতি যৌন সন্ত্রাসকে তার সম্ভ্রমহানি হিসেবেই দেখতে চান লেখক। এবং জোরপূর্বক হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্ষিতা নারীর আনন্দ পাবার সম্ভাবনাও উনি দেখতে পাচ্ছেন। সম্ভবত সাবিত্রী অক্ষতযোনী কুমারী না হলে সে আনন্দও পেতে পারতো এমন ধরে নিয়ে লেখক তাঁর সাক্ষ্য বা জবানবন্দীতে তাঁর দুই বছর আগে রজঃস্বলা হবার এবং স্বামী সহবাসের অভিজ্ঞতা না থাকবার উল্লেখ করেছেন। এই বিবাহিত হয়েও কুমারী থাকার ব্যাপারটি অস্বাভাবিক হলেও তা যুগপৎ দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করে। এক সাবিত্রীকে বেশি কাম্য করে তোলে, দুই তাঁর প্রতি যে বলাৎকারই হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সাহায্য করে এবং তাঁকে পাঠকের করুণার পাত্রী হিসেবে উপস্থাপন করে।

'সতীরই কেবল ধর্ষণ হয়ঃ সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা'[৪] প্রবন্ধে ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা দেখিয়েছেন কীভাবে বিবাহিতা, সন্তানের জননী এবং যৌন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোন নারীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ সংঘটিত হলে তা মেডিক্যাল টেস্টে খারিজ করে দেওয়া সম্ভব হয়। এমনকী কিশোরী বা বালিকাদের কিছু শারীরিক লক্ষণ বিচার করে তাদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া ও তাদের যৌন অভিজ্ঞতা আছে বিধায় ধর্ষণের আলামত নেই বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালের নভেম্বরের আট তারিখে নেওয়া যে সকল সাক্ষ্যের কথা উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে সেখানে মেডিক্যাল টেস্টের অংশে শুধু সাবিত্রীর বয়স যে আসলেই ষোল তা নির্ধারিত হয়েছে, ধর্ষণ বিষয়ে সেখানে কোন মন্তব্য নেই। দুকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যের অনুলিপিও উপন্যাসের শেষে যুক্ত করা হয়েছে এবং তাতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যৌন সম্পর্ক হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে উল্লেখ নেই (এই সাক্ষ্যেও কিছু তথ্যগত গরমিল রয়েছে, যেমন দুকড়ি জানাচ্ছেন যে ভাদ্র মাসে তিনি বর্ধমানে অবস্থানরত স্ত্রীর সন্ধান পান, ব্রাকেটে নভেম্বর ১৯৩৮। কিন্তু বাংলা ভাদ্র মাস হয় ইংরেজি আগস্ট সেপ্টেম্বরে, নভেম্বরে নয়)।

সাবিত্রীর জবানবন্দীতে বলা হয়েছে যে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সহবাসের অভিজ্ঞতা ছিল না যদিও সে দুই বছর আগে রজঃস্বলা হয়েছে। এই অংশটা যদি সত্যিই সাক্ষ্যে থেকে থাকে তাহলে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার, ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ ভারতের গ্রামের কিশোরী আদালতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার আগেই স্বামী সহবাস বা রজঃস্বলা হবার তথ্য জানাচ্ছেন। সাবিত্রীর সাক্ষ্যের অংশটা সত্যি ধরে নিলে বলা যায় নারীদেহের পবিত্রতা ও তার লংঘন সংক্রান্ত সামাজিক মিথের মধ্যে থেকে নারীর অসহায়ত্বকে মূল উপজীব্য ধরে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়েছে। সাবিত্রীকে করুণা করার মাধ্যমে লেখক এক ধরনের স্যাডোম্যাসোকিজমের চর্চা করছেন।

ধর্ষক ও পুরুষ

এখন ধর্ষকদের প্রসঙ্গে আসা যাক। লেখক দেখাচ্ছেন যে ধর্ষকদের একজন বিবাহিত এবং স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ থাকার পরেও যৌনক্ষুধায় ভুগছিল কেননা তার স্ত্রীর মাসিক চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কয়েকদিন স্ত্রী সংসর্গ থেকে বঞ্চিত থাকলেই কি পুরুষের ধর্ষক হয়ে ওঠার কথা?

স্ত্রীর মাসিকের উল্লেখ করে লেখক সম্ভবত ধর্ষণকে যৌন অবদমনের ফলাফল হিসেবে দেখাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস পেয়েছেন।

Understanding the Predatory Nature of Sexual Violence[৫] প্রবন্ধে **David Lisak** তিন ধরনের ধর্ষকের কথা উল্লেখ করেছেন-

The two primary and numerically largest types identified by Groth were the 'power' rapist and the 'anger' rapist. The power rapist was motivated by his need to control and dominate his victim, and inversely, to avoid being controlled by her. The anger rapist was motivated by resentment and a

general hostility towards women, and was more prone to inflicting gratuitous violence in the course of a rape. Not surprisingly, these types were rarely found in pure form. Most rapists were actually blends of power and anger motivations; however, a predominance of one or the other was often discernible. The third and (thankfully) numerically far smaller type was the sadistic rapist. This rapist was motivated by the sexual gratification he experienced when he inflicted pain on his victim.

(গ্রথ শনাক্ত করেছেন সংখ্যার দিক থেকে বড় দুটি প্রকার, 'ক্ষমতা' ধর্ষক এবং 'ক্রোধ' ধর্ষক। ক্ষমতা ধর্ষক উদ্দীপ্ত হয় তার শিকারকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন থেকে, অপরপক্ষে শিকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হতে চেয়ে। ক্রোধ ধর্ষক উদ্দীপ্ত হয় কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা বা নারীর প্রতি সাধারণ শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব থেকে এবং সাধারণত ধর্ষণের সময় অধিক নৃশংস আচরণ করে থাকে। এটি আশ্চর্য নয় যে এই দুই প্রকারের কোনটিই পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকে না। অধিকাংশ ধর্ষক এই দুই প্রকারের মিশ্রণ; তবে কোন এক প্রকার আচরণ অন্য প্রকারের চাইতে প্রকট হয়ে ওঠে প্রায়শই। তৃতীয় প্রকার এবং সংখ্যায় (সৌভাগ্যক্রমে) কম সংখ্যক ধর্ষক হলো 'স্যাডিস্ট' ধরণের। এরা শিকারকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে যৌন আনন্দ লাভ করে থাকে)

এই প্রবন্ধের লেখক আরো বলেন যে ধর্ষণ সম্পর্কিত যে সকল মিথ সমাজে প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে একটি হলো ধর্ষক একজন মুখোশ পরিহিত ঝোপের আড়ালে লুকানো অপরাধী, অথচ বাস্তবে রেপিস্ট প্রায়ই ভিক্টিমের চেনাজানা পরিচিত বা বন্ধুমহলের কেউ হয়ে থাকে। সাবিত্রীর ক্ষেত্রেও ধর্ষকরা একই গ্রামের অধিবাসী ও পূর্বপরিচিত ছিল।

একথা মোটামুটি স্বীকৃত যে ধর্ষণের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক যতখানি তার চাইতে বেশি সম্পর্ক ক্ষমতার এবং নারীবিদ্বেষের। নারীকে মানবেতর প্রাণী ভাবার প্রবণতাও খানিকটা দায়ী। এই উপন্যাসে ধর্ষক পুরুষদের প্রতি ঘৃণা ছুঁড়ে দেবার সময় বারবার তাঁদেরকে পশু, জানোয়ার বা মানবেতর কিছু বলে উল্লেখ করার মধ্যে দিয়েও লেখক গড়পরতা সকল পুরুষকে ধর্ষণের দায় থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস পাচ্ছেন। সুযোগ পেলে একজন বিবাহিত গৃহস্থও যে ধর্ষণের মতন অপরাধে লিপ্ত হতে পারেন তা জেনেও লেখক সেই অপরাধীকে মানুষ বলে মানতে নারাজ। এই প্রবণতাটি খুবই পুরুষতান্ত্রিক এই জন্যে যে, এতে করে পুরুষের ভেতরের সুপ্ত ধর্ষকামকে ধামাচাপা দিয়ে লুকিয়ে ধর্ষককে ভিন্ন প্রজাতির কোন প্রাণী হিসেবে কল্পনা করে নেওয়া সহজ হয়। দূর্গা, বটা বা সবুর যে ভিনগ্রহের প্রাণী নয়, তারা যে আর যে কোন পুরুষের মতন আর যে কোন পুরুষ যে তাদের মতন হয়ে উঠতে পারে বা পারতো এই সত্যটাকে অস্বীকার করার জন্যে তাদের পশু হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরী ছিল।

দূর্গার স্ত্রী ঋতুমতী বলে 'খেতে দেয়নি' একথা জানিয়ে ধর্ষকের যৌনক্ষুধার ব্যাপারটা সামনে নিয়ে আসেন লেখক। ধর্ষণের সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রকাশের সম্পর্কটিকে সূক্ষভাবে আড়াল করা হয় এভাবে। ধর্ষণকে অনেকটাই যৌনতার প্রকাশ হিসেবে দেখেন এবং যা খুবই পরস্পরবিরোধী তা হলো, এই ধর্ষকদের আবার পশু বা মানবেতর প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করে যে কোন পুরুষকে পটেনশিয়াল ধর্ষক হিসেবে না দেখার চেষ্টা করেন।

লেখকের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এ জন্যে দায়ী হতে পারে। দিল্লীর গ্যাং রেইপ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের নিয়ে বানানো ডকুমেন্টারি ফিল্মের নির্মাতা লেসলি উডউইন এক সাক্ষাৎকারে[৬] বলেন,

To call them 'monsters' as the media has consistently done is to coin sensationalist headlines which sell newspapers and attract viewers, and furthermore to pedal the lie to society that 'we' are distanced from 'them'. This is a mirage and an irresponsible lie. 'We' bear considerable responsibility for their attitudes and their resultant actions.

(তাদের 'দানব' বলে উল্লেখ করা, যা গণমাধ্যম সর্বদাই সংবাদপত্র বিক্রি বা দর্শক টানার উপায় হিসেবে করে থাকে,মূলত সমাজে একটি মিথ্যা প্রচার করে যে 'আমরা' আসলে 'ওদের' থেকে অনেক আলাদা। এটি একটি প্রহসন এবং দায়িত্বহীন মিথ্যা। 'আমরা' তাদের মনোভাব এবং কার্যকলাপের জন্যে অনেকাংশেই দায়ী)

হাসান ফেরদৌস মনে করেন লেখকের দায়িত্ব লেখক পালন করেছেন, পাঠক থেকে মানুষ হয়ে ওঠা আমাদের দায়িত্ব। ধর্ষককে এবং তাদের কার্যকলাপকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে লেখক খুব বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন একথার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত নই।

শেষ কথা

সাহিত্যে জীবনের সকল দিকের প্রতিফলন ঘটে। কাজেই মৃত্যু, জরা, ক্ষুধা, মহামারীর মতন মানবিক সংকট যেভাবে আসে হত্যা, ধর্ষণ, খুন, লুটতরাজের মতন অপরাধের উল্লেখও আসবেই। ধর্ষণ নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হাতে গোনা। ধর্ষণ বা ধর্ষণপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে মূল উপজীব্য করে লেখা উপন্যাস হিসেবে সাবিত্রী উপাখ্যান অনেক বেশি সমাদৃত ও প্রশংসিত হলেও সাহিত্যে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক প্রথা ভেঙে ধর্ষণের মতন নারীর প্রতি অবমাননাকর ঘটনাকে মানবিক দৃষ্টি থেকে দেখার চেষ্টায় লেখক সর্বাত্মকভাবে সফল হননি।

উপন্যাসে ধর্ষণের বর্ণনাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে গিয়ে লেখক ভাষার ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে পারেননি। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা ধর্ষণকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে দেখাতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত যৌন এডভেঞ্চারের চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

উম্মে ফারহানা: শিক্ষক, লেখক
ইমেইল: ummefarhanamou@gmail.com

তথ্যসূত্রঃ

১। হাসান আজিজুল হক, সাবিত্রী উপাখ্যান , ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ ২০১৩
২। হাসান ফেরদৌস, "বেদনায় ভরা পেয়ালা", কালি ও কলম, এপ্রিল ২০১৪।
৩। উম্মে রায়হানা,'গল্প-কথা-দৃশ্যঃ উপভোগ বনাম হুমকি', নারী ও প্রগতি জার্নাল, সংখ্যা ১৯, জানুয়ারি-জুন, ২০১৪
http://bnps.org/journal/19/Story_enjoyment%20vs%20-threat.pdf
৪। ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা, 'সতীরই কেবল ধর্ষণ হয়ঃ সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার সামাজিক বাস্তবতা', নারী ও প্রগতি জার্নাল , সংখ্যা ২১, জানুয়ারি-জুন ২০১৫
http://bnps.org/journal/21/Evidence%20Act.pdf
৫। David Lisak, Understanding the Predatory Nature of Sexual Violence, Sexual Assault Report, Volume 14, Number 4, March/April 2011.
http://www.davidlisak.com/wp-content/uploads/pdf/SA-RUnderstandingPredatoryNatureSexualViolence.pdf
৬। Gulte.com এ প্রকাশিত লেসলি উডউইনের সাক্ষাৎকার, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫
http://www.gulte.com/news/45303/Leslee-Udwin-Responds-On-Worst-Monster-%20Juvenile